ম ঞ্চ স ং বা দ

এপ্রিল ☐ ১৯৯৪ সংখ্যা : ৯৯-১০৩ ☐ সদস্য ও সহযোগী বন্ধুদের জন্য

হেস্টিংস জুট : মালিকের স্বেচ্ছাচারিতার আর এক নজির

গত ২৬ ফেব্রুয়ারি রিষড়ার হেস্টিংস জুট মিলের দুহাজার শ্রমিক মর্নিং শিফটে কাজ করতে গিয়ে দেখে, ম্যানেজমেন্ট 'সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক'-এর নোটিশ টাঙিয়ে দিয়েছে। বিক্ষোভে ফেটে পড়েন তারা। পুলিশ এফ আই আর থেকে জানা যায় যে, বিক্ষুব্ধ শ্রমিকেরা গেটের তালা ভেঙে সিকিউরিটি অফিস, জি.এম. কোয়ার্টার্স, এগারটি স্টাফ কোয়ার্টার্স-এ ভাঙচুর করে। আক্রান্ত হয় লেবার অফিসার রাম জনম দুবের বাড়ি ও ইউনিয়ন নেতা রাম নাগিনা যাদব ও আবদুল কুদ্দুসের কোয়ার্টার্সও। আটটা নাগাদ পুলিশ যায়, জারি হয় ১৪৪ ধারা, নামান হয় ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলসকে। চলতে থাকে শ্রমিক লাইনে পুলিশি সন্ত্রাস।

পুলিস রিপোর্ট : মিলের চিফ সিকিউরিটি অফিসার হরিনাম থাপার-এর শ্রীরামপুর থানায় দায়ের করা এফ আই আর থেকে বারো জনের নাম পাওয়া যায়। উত্তেজনা ছড়ান, প্ররোচনামূলক বক্তৃতা এবং পাঁচ-সাতশ শ্রমিককে নিয়ে মিল ভাঙচুরের অভিযোগ দেওয়া হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে। পুলিশ কাশীনাথ সিং, শংকর বিজয় শ ও শম্ভু শকে গ্রেপ্তার করে, জামিন অগ্রাহ্য হয়, ১১ মার্চ অবধি জেল কাস্টডিতে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়।

ত্রিপাক্ষিক চুক্তি : হেস্টিংস জুট মিল (ডিভিশন অফ শ্রী দিগ্বিজয় সিমেন্ট) ৮ই অক্টোবর ১৯৯৩-তে বন্ধ হয়ে যায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রম কমিশনারের উপস্থিতিতে ১৯ জানুয়ারি ১৯৯৪-তে মিল মালিক ও ইউনিয়নের মধ্যে যে চুক্তি হয় তার ফলে ২২ জানুয়ারি মিলটি খোলা হয়। চুক্তিতে সমস্ত শ্রমিককেই ধাপে ধাপে কাজ দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। এই মিল খোলা কুড়ি দিনের মধ্যেই নিয়োগের কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার কথা। যেসব শ্রমিকরা বাইরে রয়েছেন তাদের কাজে যোগ দেওয়ার জন্য পনের দিন সময় দেওয়া হয়েছিল। চুক্তির আরেকটি ধারায় মিলের উৎপাদন বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছিল "প্রয়োজনীয় কাঁচামালের যোগান সাপেক্ষে" এই বিশেষ বাক্যটি হাতে লেখা হয়েছিল। চুক্তিতে ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৫ মার্চের মধ্যে বকেয়া বোনাস, ৬টি কিস্তিতে ফেরৎযোগ্য তিনশ টাকা অগ্রিম দেওয়ার কথাও ছিল।

স্বেচ্ছাচারিতা : প্রথম থেকেই মিল মালিক চুক্তিভঙ্গ করতে শুরু করেন। ২২শে জানুয়ারি মিল খোলা হলেও উৎপাদন শুরু হয় ১৫ ফেব্রুয়ারি। ২৬ ফেব্রুয়ারি কারখানা বন্ধের দিন পর্যন্ত পাঁচ হাজার শ্রমিকের মধ্যে কাজ পায় সাড়ে তিন হাজার কর্মী। অতীতে লক-আউট বা ধর্মঘটের পর মিল চালু হতে এত সময় আর লাগে নি। অন্যদিকে কাঁচা পাটের অভাবের ফলে ঠিকা বা বদলি শ্রমিকেরা বা স্পেশাল বদলিরাও কাজ পায়নি। কর্তৃপক্ষ নানান ডিপার্টমেন্টে লোক বদলি করে, লোক কমিয়ে কাজের চাপ বাড়ানোর চেষ্টা করতে থাকে। অসংগঠিত প্রতিবাদ কখনও কখনও কোন কোন ডিপার্টমেন্ট থেকে উঠতে থাকে। যেমন টিফেনের সময় চল্লিশ মিনিটের জায়গায় কুড়ি মিনিট করার চেষ্টা শ্রমিকদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদেই বন্ধ হয়।

ইতিমধ্যে আরেকটি ঘটনা শ্রমিকদের ক্ষুব্ধ করে তোলে। চুক্তিতে উদ্বৃত্তের কোনও কথা না থাকলেও দুশ জন শ্রমিককে স্বেচ্ছাঅবসর দেওয়া হয়। ইউনিয়ন নেতারা জানলেও শ্রমিকদের তা জানায় নি। ১৯৮৮ সালে রাজ্য সরকার মালিকদের সংস্থা ইন্ডিয়ান জুট ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যাসোসিয়েশন ও কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি মধ্যে যে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি হয় তাতে বলা আছে- হেস্টিংস জুট মিলে আঠারো শিফট-এ চার হাজার ছ'শ ছাব্বিশ জন শ্রমিক লাগবে অথচ ১৯৯১ সালের হিসাব অনুযায়ী এই মিলের শ্রমিক সংখ্যা চার হাজার আটশ এগার। উদ্বৃত্ত প্রায় দুশ জনই।

অদৃশ্য আঁতাত : ২৬ ফেব্রুয়ারি ভোরে যে বিক্ষোভ সংগঠিত হয় তার ধরন, গতিপ্রকৃতি, প্রশাসন ও রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা দেখে অনেকের মনেই এই সন্দেহ উঁকি মারছে যে এই ঘটনা যেমন মিল মালিকের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ তেমনই এর পিছনে অন্য উদ্দেশ্য থাকতে পারে। যেমন, মিল খোলার পর থেকেই মালিক গুদামে জমে থাকা তৈরি মাল বের করতে শুরু করে। ২৪ ফেব্রুয়ারি সারারাত ধরে মাল বের করা হয়। সাড়ে তিন কোটি টাকার জমে থাকা তৈরি মাল গুদাম থেকে বের করে নেওয়ার উদ্দেশ্যেই কি ইউনিয়ন ও রাজনৈতিক দলগুলির সহায়তায় এই নাটক সংগঠিত হয়েছিল? ঘটনার সময় সি পি এম সমর্থক সমাজবিরোধী কারখানার শ্রমিক ন্যাড়া সোফিক ঘটনার উপস্থিত থাকলেও তার নাম এফ আই আর-এ পাওয়া যাচ্ছে না। এমনকি এফ আই আর-এ অনেকের নাম আছে যারা ঘটনার সময় উপস্থিতই ছিল না বলে শ্রমিকদের অভিযোগ। সি আই টি ইউ নেতারা বহাল তবিয়তেই আছেন, যদিও এলাকায় সন্ত্রাস চলছে। ঘটনার সময় রিষড়া মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার সোফিক এবং পরের দিনই সি পি এম সাংসদ সুদর্শন রায়চৌধুরীর উপস্থিতিও উল্লেখ্য।

হাতবদল : হেস্টিংস জুট মিলের হাতবদল আসন্ন। বাঙ্গুরদের হাত থেকে জুট ট্রেডার মুরলিধর রতনলাল-এর মালিক কেজরিয়ালরা মিলটি নিতে চলেছে। যদিও হেস্টিংসের পাশেই ওয়ারধাদের চাঁপদানী ইন্ডাস্ট্রিজ মিল। শোনা যাচ্ছে ওয়ার্ধারাও এই মিলটিকে নিতে আগ্রহী। সর্বশেষ সংবাদ, বাঙ্গুরদের হাত থেকে মুরলিধর রতনলালরা এক এম ও ইউ-র মাধ্যমে কারখানাটি কিনে নিয়েছে। বিষয়টিতে রাজ্য সরকারের সমর্থন আছে। ইতিমধ্যে বকেয়া বোনাসের টাকা শ্রমিকদের মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মিলটি খোলার ক্ষেত্রে আবার সমস্যা দেখা দিয়েছে। বিভিন্ন ব্যাঙ্ক ও অর্থলগ্নি সংস্থা এই মালিকানা হস্তান্তর বৈধ নয় জানিয়ে আইনি ব্যবস্থা নিতে চলেছে।

স্ট্যাণ্ডার্ড-ওপেক : নীরব রাজ্য সরকার

পূর্বভারতে জীবনদায়ী ওষুধ পেনিসিলিন উৎপাদনকারী একমাত্র কারখানা শ্রীরামপুরের স্ট্যাণ্ডার্ড ফার্মাসিউটিক্যালস ও ওপেক ইনোডেশন গত ৩০শে মে ৯১ থেকে বন্ধ। গত তিন বছরে ৩৫ জন শ্রমিক অনাহারে মারা গেছে, ৩জন আত্মহত্যা করেছে। তবু রাজ্য সরকার রহস্যজনকভাবে নীরব।

গত ২১শে মার্চ শ্রীরামপুর থেকে স্ট্যাণ্ডার্ড-ওপেক অবিলম্বে খোলার দাবিতে শ্রমিকবৃন্দের স্ট্যাণ্ডার্ড-ওপেক বাঁচাও কমিটির নেতৃত্বে একটি সাইকেল মিছিল বালি, বরাহনগর, দমদম সহ বিভিন্ন স্থান পরিক্রমা করে ২২ তারিখ কলকাতায় পৌঁছে ধর্মতলায় মেট্রোর সামনে অবস্থান বিক্ষোভ করে। বেলা তিনটের সময় শিল্পমন্ত্রী বিদ্যুৎ গাঙ্গুলির সাথে দেখা করে অঞ্চলের সাড়ে তিন হাজার মানুষের স্বাক্ষরিত স্মারকলিপি শিল্পমন্ত্রীর কাছে জমা দেয় ও এব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে অনুরোধ করেন। ওই আলোচনায় মন্ত্রী জানান, তিনি স্ট্যাণ্ডার্ডের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে কিছুই জানেন না (যদিও তিনি এ বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত এবং এই সংস্থার প্রাক্তন কর্মচারী)। শ্রমিকদের উল্লেখযোগ্য দাবিগুলি হল :

★ কোন শ্রমিককে বাইরে রেখে কারখানা খোলা চলবে না।
★ শ্রমিকদের সমস্ত বকেয়া পাওনা মিটিয়ে দিতে হবে।
★ কারখানা না খোলা অবধি সকল শ্রমিককে ভাতা দিতে হবে।

নাগরিক মঞ্চ-র কর্মসূচী

★ ২মে '৯৪ বিকেল ৪টেয় শিয়ালদহ স্টেশনে পথসভা ও 'আক্রান্ত শ্রমিক' প্রকাশ ★ সাকিনা বেগম স্মারক বক্তৃতা - ২৮মে, ৯৪ : বিষয় -- 'আইন কতটা শ্রমিক-স্বার্থ রক্ষাকারী ?'

★ ২৫-জুন ৯৪ 'শিল্প জানতে শ্রমিকদের যা জানা প্রয়োজন'

ন্যাশনাল ট্যানারির সর্বশেষ অবস্থা

স্বদেশী শিল্প গড়ার প্রেরণায় প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল ট্যানারী এখনও বন্ধ। শ্রমিক নেতাদের দ্বারা ঘোষিত 'নজির সৃষ্টিকারী লক আউটের' পর কলকাতা হাইকোর্ট থেকে নিলামে প্রায় দু-বছর আগে কোম্পানীটি কিনেও 'শিল্পদ্যোগী' পশ্চিমবঙ্গ সরকার আজও তা চালু করেননি। ফলস্বরূপ— অনাহারে বিনা চিকিৎসায় ১৫জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে।

যথেষ্ট সম্ভাবনাপূর্ণ এই চর্মশিল্পটি অধিগ্রহণের পরেও কেন সরকার চালু করছেন না— তা আজ সকলেরই প্রশ্ন। মাত্র ৫০ লক্ষ টাকায় শ্রমিকদের অনুরোধে কলকাতা হাইকোর্ট পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে কারখানাটি দেয়। কিন্তু ইতিমধ্যে অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকদের প্রাপ্য না দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার কারখানাটি কেনার পর থেকে টালবাহানা শুরু করে। আজ পর্যন্ত রাজ্য সরকার আদালতের আদেশ অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিক-প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনায় বসেননি। আই এন টি ইউ সি ও সিটু-র দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের পরিত্যাগ করে এখানকার প্রায় সমস্ত শ্রমিক অঞ্চলের মানুষকে নিয়ে গড়ে তুলেছেন ন্যাশনাল ট্যানারী বাঁচাও কমিটি। এই কমিটির নেতৃত্বে ও নাগরিক মঞ্চ-র সহযোগিতায় শ্রমিকরা এই সম্ভাবনাপূর্ণ শিল্পটিকে পুনরায় চালু করার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। গত জানুয়ারি মাস থেকে বাঁচাও কমিটি লাগাতার কর্মসূচী চালিয়ে যাচ্ছেন। ইতিমধ্যে ১২ ফেব্রুয়ারি বেলেঘাটার রাসমণি বাজারে ও ১৮ ফেব্রুয়ারি এসপ্ল্যানেডে মেট্রোরেল স্টেশন চত্বরে ৩০০ শ্রমিক ও তাদের পরিবার এবং অঞ্চলের মানুষেরা ১২ ঘন্টার অবস্থান করেন। মুখ্যমন্ত্রীকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। মৃত শ্রমিকদের স্ত্রীরাও এই অবস্থানে উপস্থিত ছিলেন।

রাজ্য সরকার কারখানা খোলার কোনও উদ্যোগ না নিলেও লক আউটের আগের পর্যায়ে অন্তর্বর্তীকালীন পরিচালকমণ্ডলী হিসেবে যে স্বঘোষিত শ্রমিক নেতারা কারখানা চালাচ্ছিলেন (পড়তে হবে লুটেপুটে খাচ্ছিলেন) এবং যাদের বিরুদ্ধে সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিক একত্রিত হয়ে আদালতে দুর্নীতির অভিযোগ এনেছিলেন, তাদেরই একজনকে রাজ্য সরকার মাসিক এক হাজার টাকার বিনিময়ে কারখানা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দিয়েছেন। এর বিরুদ্ধেও বাঁচাও কমিটি ও নাগরিক মঞ্চ সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রতিবাদ জানিয়েছে। ইতিমধ্যে কোর্ট লিকুইডেটর সঠিক সময়ে কিস্তির টাকা জমা না দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারকে জানালে, সরকার ৩১ মার্চ '৯৪ এর মধ্যে ১৫ লক্ষ টাকা ও বাকি টাকা আগামী আর্থিক বছরে দেবে বলে জানিয়েছে। অন্যদিকে, সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিকরাও দীর্ঘদিন সরকারের প্রতি আস্থা রাখার পর আদালতে সরকার অধিগ্রহণ করার সময় থেকে বেতন, কারখানা খোলা ও অন্তর্বর্তী পরিচালক কতিপয় শ্রমিক নেতা বা ম্যানেজমেন্ট কমিটির হাতে থাকা ৮ লাখ টাকা দেওয়ার দাবি জানিয়েছে। আবেদন আদালতে বিচারাধীন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার শ্রমিকদের আবেদনে জলের দরে বিশাল সম্পত্তি পেয়ে কোনও ব্যক্তি মালিককে দিয়ে চালাবেন বলে শোনা যাচ্ছে। যদিও সরকার চালাবেন বলেই শ্রমিকদের অনুরোধে মাত্র ৫০ লক্ষ টাকায় ১ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকার সম্পত্তি পেয়েছিল। ইতিমধ্যেই শ্রমিকরা আদালতে জানিয়েছে, সরকার নিজে না চালালে অন্য কাউকে দেওয়ার অধিকার সরকারের নেই। সরকার না চালালে শ্রমিকরা নিজেরা কো-অপারেটিভ করে চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। উল্লেখ্য, রাজ্য সরকার কারখানা চালানোর উদ্যোগ না নিলেও নিজেদের সুকর্মের ফিরিস্তি দেওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত আর্থিক সমীক্ষা (৯৩-৯৪)তে "রাজ্য সরকার ন্যাশনাল ট্যানারী কোম্পানী কিনে নিয়েছেন" বলে উল্লেখ করেছেন।

কামানি গোষ্ঠীতে দ্বিতীয় শ্রমিক সমবায়

বম্বের কামানি গোষ্ঠীর কোম্পানী, কামানি মেটাল অ্যাসোসিয়েট লিমিটেড (কে এম এ)-এ নতুন শ্রমিক সমবায় চালু হলো। ১৩ মার্চ ১৯৯৪ থেকে এই সমবায়ে তাদের বিভিন্ন পণ্যের (যেমন ইনসুলেটর ইত্যাদি) বিক্রয়যোগ্য উৎপাদন শুরু হলো। শ্রমিকরা জোরের সঙ্গে ঘোষণা করেছেন যে আগামী দুবছরের মধ্যেই কোম্পানী লাভের মুখ দেখবে। কাজ শুরু করার প্রথম মাসেই শ্রমিকরা ১৫০ টনের অর্ডার সংগ্রহ করেছেন—কোম্পানী যখন স্বাভাবিকভাবে উৎপাদন করতো এই পরিমাণ তার চল্লিশ শতাংশ-এর মতো। কামানী ইউনিয়নের মতে সমস্ত প্ল্যান্টে পুরোমাত্রায় কাজ চালু হলে বার্ষিক আয় ৪০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে।

এই সমবায় গঠন করতে শ্রমিকরা হিম্মতের সঙ্গে বি আই এফ আর-এর ৫১১.১৪ লক্ষ টাকার এক পুনরুজ্জীবন প্রকল্প জমা দিয়ে তার অনুমোদন আদায় করে আনে। এই পরিকল্পনা শ্রমিকদের স্বার্থত্যাগের এক চূড়ান্ত উদাহরণ। এই সমবায় রূপায়ণে শ্রমিকরা ২ কোটি টাকার ইকুইটি কিনবে—শ্রমিকপ্রতি ভাগে পড়ছে ২০ হাজার টাকার ইকুয়িটি। এ ছাড়াও ক্লোজার থাকার তিন বছর সময়ের মাইনের অর্ধেকটাই শ্রমিকরা ছেড়ে দিচ্ছেন—৫ বছর মাইনে বাড়বে না, এ ছাড়া ৫-৬ বছর বোনাস নেবেন দেরীতে।

বন্ধ থাকার সময়ে মোট এক হাজার শ্রমিকের মধ্যে সাড়ে আটশো ধাপে ধাপে যোগ দেবেন। এমন সমবায়ের জন্য সরকারী সাহায্যের পরিমাণ নগণ্য : যেখানে প্রত্যেক শ্রমিক কিনছেন ২০ হাজার টাকার ইকুয়িটি, সেখানে মহারাষ্ট্র সরকার এবং আই ডি বি আই মাত্র ৫০ লক্ষ টাকার ইকুয়িটি কিনছে। এছাড়া ২১১.৪০ লক্ষ টাকার দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দিচ্ছে আই ডি বি আই ও ৫টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক।

এমন আদর্শ সমবায়ের বিরুদ্ধে কামানী মালিক গোষ্ঠী AIFR -এ আবেদন করেছে, যদিও আপিলেট কোনো স্থগিতাদেশ দেয়নি। এছাড়া মালিকরা এই সমবায়ের বিরুদ্ধে স্থগিতাদেশ চেয়ে কলকাতা, বোম্বে আর ব্যাঙ্গালোর হাইকোর্টে আবেদন জানালে তিন শহরের হাইকোর্ট তা সরাসরি নাকচ করে।

কারখানার পরিচালক মণ্ডলীতে আছেন তিনজন শ্রমিক প্রতিনিধি আর সরকার ঋণদায়ী সংস্থা আর BIFR -এর একজন করে প্রতিনিধি।

সমবায় আধুনিকীকরণেরও কথা ভাবছেন। এতে আরও শ্রমসংস্থান হবে অদূর ভবিষ্যতে।

বন্ধ কারখানার জমি

গত কয়েক বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গে নতুন কোন শিল্প স্থাপন হচ্ছে না কেন এ নিয়ে আছে নানা বিতর্ক। কেন্দ্র-রাজ্য পরস্পর দোষারোপে ব্যস্ত। কিছুদিন আগে মনমোহন সিং সংসদে জানিয়েছেন যে, পশ্চিমবঙ্গে গত তিন বছরে নতুন শিল্পে বিনিয়োগ মাত্র ১২.৫ কোটি টাকা।

কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাবার পর যখন আদালতের আদেশে কারখানা চালু রাখার প্রতিশ্রুতিতে বিক্রি হয় তখনও দেখা যাচ্ছে কিছুদিন বাদে কারখানা আবার বন্ধ করে শেড, মেশিন এসব স্ক্র্যাপ করে দেওয়া হয় এবং কারখানার জমিতে বহুতল বাড়ি উঠতে শুরু করে। বহুদিন ধরে বন্ধ পড়ে থাকা কারখানার কথা তো বলাই বাহুল্য। হাওড়া, ব্যারাকপুর, দমদম, বরানহর, বেলঘাছিয়া, সোদপুর, আগরপাড়া অঞ্চলে এরকম বহু উদাহরণ আছে।

বঙ্গোদয় কটন মিল : বিটি রোডের ধারে সোদপুরে সরকারি নথিপত্রে এখনও টিকে থাকা এই মিলটি ১৯৮৭ সাল থেকে বন্ধ। শ্রমিক সংখ্যা ছিল ৭০০। এরই ৭০ বিঘা জমির ওপর তৈরি হল 'পিয়ারলেস আবাসন' — পানিহাটি পৌরসভার আনুকূল্যে যার ডেভেলপমেন্ট ফি বাবদ ৫২ লক্ষ টাকার বদলে ১৫ লক্ষ টাকা দিতে হয়েছে।

বেঙ্গল এনামেল কারখানা : পলতার কাছে দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকার পর এখন সেখানেও বহুতল ফ্ল্যাটবাড়ি তৈরি হচ্ছে।

সুলেখা কালি : এর বি টি রোডের ইউনিটটি বহুদিন ধরে বন্ধ। এখানকার ১৬ বিঘার মতো জমি কেনার চেষ্টা চালাচ্ছে সেই পিয়ারলেসই।

ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাস্ট্রিজ (দীপ্তি হ্যারিকেন) : ১৯৮৭ সাল থেকে বন্ধ কারখানাটি লিকুইডেশনে যায় এবং এক প্রোমোটার চালু কারখানা হিসেবে এটি কিনে নেয়। বর্তমানে সিটু ও আই এন টি ইউসি-এর সাথে চুক্তি করে মুরারী আগরওয়াল নামের এক কালোয়ার কারখানাটির ৬০০ শ্রমিকের মধ্যে প্রায় অর্ধেক শ্রমিককে ৫-১০ হাজার টাকা দিয়েছে। মেশিন, শেড ইত্যাদি স্ক্র্যাপ করে সেখানকার জমিতে বহুতল বাড়ি তৈরি শুরু করেছে।

ট্রাম কোম্পানীর জমি : সরকার নিযুক্ত মনিটরিং কমিটি সুপারিশ করেছে যে কলকাতা ট্রামওয়েজের বিভিন্ন ডিপোর জমি বেসরকারি সংস্থাকে বিক্রি করা হবে বাড়ি ও দোকানঘর তৈরির উদ্দেশ্যে। এইসব সংস্থার মধ্যেও পিয়ারলেস অন্যতম।

নাগরিক মঞ্চ-এর পক্ষে বিভাস বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ১৩৪, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড, রুম নং-৭ কলিঃ ৭০০০৮৫ হইতে প্রকাশিত।